Smaranika Banerjee,

Assistant Professor,

Department of History,

Chakdaha College

Scanned with OKEN Scanner

৭. সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণ

সুদীর্ঘ সাত শতাব্দীর অধিক কাল প্রাণবন্ত অস্তিত্বের পর সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তি কি কারণে ঘটেছিল তা একটি বিতর্কিত বিষয়। প্রত্নস্থল ও প্রত্নবস্তুগুলি পরীক্ষা করে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এর বিলুপ্তির কারণ অনুমান করেন মাত্র। সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার আজও না হওয়ায় অনুসন্ধানের কাজ আরও দুরূহ হয়েছে। বৈদেশিক আক্রমণকে পতনের অন্যতম কারণ বলে মনে

Scanned with OKEN Scanner

করা হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছালে তবেই বৈদেশিক আক্রমণ পতনকে ত্বরান্বিত করতে পারে। পণ্ডিতরা মনে করেন বিভিন্ন নগর ধ্বংস হয়েছিল বিভিন্ন কারণে এবং হয়েছিল ক্রমান্বয়ে, আকস্মিক ভাবে নয়। ঐতিহাসিকগণ সিন্ধু সভ্যতার পতনের জন্য কয়েকটি কারণের ওপর জোর দেন। যেমন, প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক জীবনে স্থবিরতা, সৃজনশীলতা ও নাগরিকবোধের অভাব।

(ক) প্রাকৃতিক : প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে প্রধান হল সিন্ধু অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন। মর্টিমার হুইলার দেখিয়েছেন, সিন্ধু নগরগুলিতে গৃহনির্মাণের জন্য পোড়া মাটির ইট ব্যবহৃত হত। স্থানীয় বনাঞ্চল কেটে ইট পোড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ সংগ্রহ করা হত। নির্বিচার বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে বৃষ্টিপাত হ্রাস পায়। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেচব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। সিন্ধুর গতি পরিবর্তনের ফলে বন্দর হিসাবে মহেঞ্জোদড়োর কোনো গুরুত্ব রইল না। বৃষ্টিপাত ও জলাভাবে কৃষিকার্য ব্যাহত হয়।

অনেকে মনে করেন মহেঞ্জোদড়ো ধ্বংস হয় ভূমিকম্পের ফলে। উৎখননের ফলে প্রাপ্ত নরকঙ্কালগুলি ক্ষতবিক্ষত ও এগুলির সৎকার হয়নি। ভূমিকম্পের ধারণার এর থেকেই সৃষ্টি। কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে হরপ্পাসহ সিন্ধু অঞ্চলের অন্যান্য নগরগুলিও যে ধ্বংস হয়েছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। প্রত্নতত্ত্ববিদ এইচ. ডি. সাংখালিয়া প্রশ্ন তুলেছেন, সাতবার নগর ধ্বংস হওয়ার পরও মহেঞ্জোদড়োবাসী নগর পুনর্নির্মাণ করে থাকলে ভূমিকম্পের পর নগর পুনর্নির্মাণে বাধা থাকার কথা নয়। অতএব ভূমিকম্প তত্ত্বকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া কঠিন।

প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে সিন্ধুনদের বন্যাকে পুরাতত্ত্ববিদগণ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। মহেঞ্জোদড়োয় অন্তত তিনবার বিধ্বংসী বন্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর ফলেই নগরটি ধ্বংস হয়। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার অন্যত্র বন্যাতত্ত্বটি প্রযোজ্য নয়। হরপ্পা ও কালিবঙ্গানে বন্যার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। এইচ. ডি. সাংখালিয়া দেখিয়েছেন, ঘর্ঘরা নদীর জল শুকিয়ে যাওয়ায় কালিবঙ্গান ধ্বংস হয়।

(খ) অর্থনৈতিক : অর্থনৈতিক স্থবিরতাকে সিন্ধুসভ্যতার অবলুপ্তির অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করেন। কৃষি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা লক্ষণীয়। কৃষি সিন্ধু উপত্যকা থেকে উর্বর গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারিত করা যায়নি। এর কারণ লৌহ ও লৌহজাত উপকরণের সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার মানুষ পরিচিত ছিল না। ফলে লাঙল ও কুঠারের মতো লৌহ নির্মিত হাতিয়ারের অভাবে গাঙ্গেয় উপত্যকায় বনাঞ্চল পরিষ্কার করে কৃষির প্রসার ঘটানো সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বাঁধ সংস্কার না হওয়ায় সেচ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে ও কৃষির প্রসার ব্যাহত হয়। পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতাগুলির সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার যে বাণিজ্যিক লেনদেন দীর্ঘকাল চলেছিল তা ক্রমে হ্রাস পাচ্ছিল। ফলে কৃষির মতো বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও স্থবিরতা প্রকট হয়ে উঠছিল।

(গ) রক্ষণশীল মনোভাব : কৃষি ও বাণিজ্যের অবহেলা, সিন্ধু সভ্যতার এই অবক্ষয় কখনই আরোপিত নয়, তা ভেতর থেকে উৎসারিত। কেন এই প্রাণবন্ত সভ্যতা কালক্রমে ধ্বংসের কোলে ঢলে পড়ে সে সম্পর্কে পণ্ডিতরা সেখানকার মানুষের রক্ষণশীল প্রকৃতিকে দায়ী করেন। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে তারা নিজেদের মানিয়ে নেয়নি। পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও সেখানকার উন্নত সেচব্যবস্থাকে সিন্ধুবাসী আয়ত্ত করেনি। প্রয়োজনীয় কারিগরী যোগ্যতা থাকলেও উন্নত কৃষি-হাতিয়ার ও ভারী অস্ত্র নির্মাণের কৃৎকৌশল তারা শেখেনি। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নাগরিকবোধের অভাব। পরপর সাতটি স্তরে মহেঞ্জোদড়োর যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তার ওপরের স্তরগুলিতে পৌরবিধি মেনে চলার অভাব লক্ষ করা যায়। মর্টিমার হুইলার মন্তব্য করেছেন, পরবর্তীকালের

Scanned with OKEN Scanner

মহেঞ্জোদড়ো ও তার প্রভাবে হরপ্পাও তাদের পূর্ববর্তী রূপের প্রতিবিম্ব মাত্র। অতএব রক্ষণশীল মনোভাব ও পরিবর্তন-বিমুখতা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বৈদেশিক আক্রমণের বহু পূর্বেই সিন্ধুবাসীর প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়। এই অবক্ষয়ের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে সমগ্র সিন্ধু সভ্যতার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

(ঘ) আর্য আক্রমণ : বৈদেশিক আক্রমণ সম্পর্কে মনে রাখা প্রয়োজন যে সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তি সব স্থানে একসঙ্গে হয়নি ও এই আক্রমণের জন্যও ঘটেনি। অনেক ক্ষেত্রে এই অবলুপ্তি ও আক্রমণের মধ্যে ব্যবধান ছিল কয়েক শতাব্দীর। যেমন, লোথালের অবনতি শুরু হয় খ্রীঃ পূঃ উনবিংশ শতাব্দীতে। পরবর্তী দুশো বছর লোথালের সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার সম্পর্ক ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। সিন্ধু অঞ্চলের অবনতি বৈদেশিক আক্রমণের কয়েক শতাব্দী পূর্বেই শুরু হয়। প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের চরিত্র দেখে বোঝা যায় যে আর্যদের আগমনের সময় পর্যন্ত আধুনিক পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চলে সিন্ধু সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল।

মর্টিমার হুইলার ও দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বীর মতো ঐতিহাসিকেরা মনে করেন এই বৈদেশিক আক্রমণ ছিল বস্তুত আর্য আক্রমণ। ঋকবেদে আর্য দেবতা ইন্দ্রকে 'পুরন্দর' বা 'পুরধ্বংসকারী' বলা হয়েছে। পুর বলতে এখানে সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলিকে বোঝানো হয়েছে। ঋকবেদে উল্লেখিত হরিওপির যুদ্ধকে অনেকে হরপ্পার যুদ্ধ বলে মনে করেন। উৎখননের ফলে প্রাপ্ত নরকঙ্কালগুলিতে ধারালো অস্ত্রের দ্বারা আঘাতের চিহ্ন, মৃতদেহগুলির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা ও সৎকার না হওয়া প্রভৃতি ইঙ্গিত দেয়, এরা নিহত হয়েছে কোন আকস্মিক আক্রমণের ফলে। অপরদিকে সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তি ও আর্য আগমনের সময় এক। উভয় ঘটনাই ঘটে খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ১৫০০ থেকে ১৪০০ অব্দের মধ্যে। ফলে ঘটনা দুটির মধ্যে সংযোগ থাকা অস্বাভাবিক নয়।

আর্য আক্রমণ তত্ত্বের কিছু দুর্বলতাও আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ এইচ. ডি. সাংখালিয়ার মতে হরপ্পার যে স্তরে শত্রুর আক্রমণে নিহত মৃতদেহগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে তার সংস্কৃতি সিন্ধু সভ্যতার থেকে ভিন্ন। তাছাড়া আর্য আক্রমণ তত্ত্বকে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। অধিকাংশ প্রমাণই কালানুক্রমিক ও শব্দতাত্ত্বিক। প্রত্নতত্ত্ববিদ ম্যাকে মনে করেন আক্রমণকারীরা ছিল বেলুচিস্তানের অধিবাসী। কেউ কেউ আবার সিন্ধু নগরীগুলির মধ্যে গৃহযুদ্ধের কথাও বলেছেন। অতএব আর্য আক্রমণের তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে অনুমান-নির্ভর। এর সমর্থনে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা যায় না। রামশরণ শর্মা ও দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা'র মত আধুনিক ঐতিহাসিকরাও মনে করেন সিন্ধু সভ্যতার মানুষ ও আর্যদের মধ্যে ব্যাপক সংঘাতের কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তির কার্যকারণ নির্ণয় কঠিন। ধরে নেওয়া যেতে পারে অর্থনৈতিক জীবনের নানান জটিল সমস্যা ও নাগরিক জীবনের গতানুগতিকতা এই সভ্যতাকে দুর্বল করে তুলেছিল। সিন্ধুর নগরসভ্যতার অবলুপ্তির পরবর্তী কালে নগরসভ্যতার পুনরায় উন্মেষ ঘটে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায়। রণবীর চক্রবর্তী সিন্ধু সভ্যতার সময়সীমাকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, এই অতি উন্নত, বৃহদায়তন, জটিল নগরাশ্রয়ী জীবনের কোনও পূর্বসূরী নেই, পরবর্তীকালের অর্থনৈতিক জীবনে তার উত্তরাধিকারীও আমাদের অজানা।

Scanned with OKEN Scanner

হরপ্পা সভ্যতার সামাজিক জীবন :

• **(১) শ্রেণিবিভক্ত সমাজ :** শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ছিল হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সভ্যতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, সেই যুগে সমাজে তিন শ্রেণির মানুষের অস্তিত্ব ছিল, যথা : বিত্তশালী শাসকগোষ্ঠী, ধনী ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণি। মিশর ও ব্যাবিলনের মতো হরপ্পার সমাজে পুরোহিতদের খুবই প্রতিপত্তি ছিল। সভ্যতার আর এক শ্রেণি ছিল শ্রমিক ও কারিগর। এদের থাকার জন্য দুই নগরেই সারিবদ্ধ 'ব্যারাক' ঘর ছিল। শ্রমিক ও ক্রীতদাসদের প্রায় সকলেই ছিল পুরোহিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্রীতদাস। তবে তারা সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত। অবশ্য হরপ্পা সভ্যতার যুগে সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল কিনা তা প্রমাণের অভাবে সঠিকভাবে বলা যায় না।

• **(২) খাদ্য :** হরপ্পা সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক হলেও এর মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। ধান, গম, যব, বার্লি, নানান ধরনের বাদাম, কড়াইশুঁটি, খেজুর, দুধ প্রভৃতি ছিল হরপ্পার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যশস্য। এখানকার অধিবাসীরা আমিষ খাদ্য হিসেবে মাছ, মাংস ও ডিম আহার করতেন।

• **(৩) পোশাক-পরিচ্ছদ ও যুদ্ধাস্ত্র :** হরপ্পা যুগে পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য প্রধানত সুতি ও পশম ব্যবহার করা হত। তাদের মধ্যে দুই অংশবিশিষ্ট পোশাকের প্রচলন ছিল — এক ভাগ দেহের ওপর ভাগের জন্য এবং অপর ভাগ দেহের নিম্নভাগের জন্য। নারী-পুরুষ সকলেই অলংকার ব্যবহার করত। নারীদের প্রধান অলংকার ছিল কানপাশা, কোমরবন্ধ ও গলার হার। হরপ্পায় প্রচুর পরিমাণে সোনা, রুপা, তামা ও হাতির দাঁতের তৈরি অলংকার পাওয়া গেছে। হরপ্পা সভ্যতার যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে কুঠার, বর্শা, তীর-ধনুক ইত্যাদির নিদর্শনও পাওয়া গেছে।

• **(৪) গৃহস্থালির সরঞ্জাম ও শিল্প :** গৃহস্থালির কাজে ব্যবহারের জন্য হরপ্পার অধিবাসীরা ধাতু ও মাটির তৈরি বাসনপত্র, কলসি, জালা, থালা, বাটি প্রভৃতি ব্যবহার করতেন। দৈনন্দিন ব্যবহার্যের মধ্যে ধাতুর তৈরি বাটখারা, সুচ, চিরুনি, কাস্তে, কুঠার, তীর-ধনুক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিল। শিল্পকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ধাতু ও পোড়ামাটির তৈরি সিলমোহর, নারীমূর্তি, কুঁজওয়ালা ষাঁড়, যোগীমূর্তি প্রভৃতি।

• **(৫) জীবিকা :** হরপ্পা সভ্যতায় অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজ করে জীবিকানির্বাহ করতেন। এমনকি শিল্পও ব্যাবসাবাণিজ্যও হরপ্পা যুগের বহু মানুষের জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায় হয়ে ওঠে। এযুগে গৃহপালিত পশু হিসেবে গোরু, ষাঁড়, মহিষ, ভেড়া, কুকুর প্রভৃতি প্রতিপালন করা হত। তবে হরপ্পা সভ্যতায় ঘোড়ার ব্যবহার ছিল কিনা সে ব্যাপারে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না।

Scanned with OKEN Scanner